

দুর্গম এলাকায় স্কুলে যাওয়ার পথই নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক >

প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ পাহাড়ি এলাকা, হাওরাঞ্চল ও চর এলাকায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলেই যেতে পারে না। শিক্ষকরাও নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না। বছরের বেশির ভাগ সময় এসব এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে অত্যন্ত কম।

জুলাই থেকে ডিসেম্বর-ছয় মাস হাওরাঞ্চলে থাকে থই থই পানি। নৌকা ছাড়া চলাচলের বিকল্প উপায়

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

দুর্গম এলাকায় স্কুলে যাওয়ার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকে না। সব পরিবারের আবার নৌকাও নেই। যাদের আছে, তারা সেটা দিয়ে মাছ ধরতে বের হয়। তাই এ সময়ে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না।

কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার জমিগুলো এক ফসলি। বছরে একবার কেবল ধান উৎপাদন হয়। বাকি সময় জমি থাকে পানির নিচে। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধান কাটা ও মাড়াইয়ের মৌসুম চলে। শিশুদেরও সে কাজে লাগানো হয়। আর জমিতে কাদা থাকায় সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোই ব্যবহৃত হয় ধান মাড়াইয়ের কাজে। ফলে বছরের সাত মাসই হাওরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কার্যত লেখাপড়া হয় না।

পাহাড়ি এলাকায় স্কুলগুলো দূরদূরান্তে অবস্থিত। রাস্তাঘাটও ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে শিশুদের পক্ষে এত দূর হেটে গিয়ে প্রতিদিন ক্লাস করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া ঝড়-বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগেও স্কুলে যাওয়ার উপায় থাকে না।

চরাঞ্চলগুলো সারা বছরই থাকে পানিবেষ্টিত। প্রতিটি চরে স্কুল না থাকায় শিশুদের যেতে হয় নৌকা বা ট্রলারে করে। এভাবে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের স্কুল করা সম্ভব হয় না।

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলা ইউনিয়নের কয়েকটি স্কুল ঘুরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির করুণ

চিত্র দেখা গেছে। কয়েকটি স্কুলে এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীকেও উপস্থিত পাওয়া যায়নি। শিক্ষকরাও স্কুলে আসার দিন ভাগ করে নিয়েছেন। যে শিক্ষক আজ আসবেন তিনি কাল আসবেন না। আবার অনেক স্কুলই চলে ঠিকা শিক্ষক দিয়ে। স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ দেয় তাঁদের। তাঁদের বাড়ি সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর আশপাশেই। পড়ানোর বিনিময়ে স্কুলের তহবিল থেকে টাকা জোগানোর পাশাপাশি নিয়মিত শিক্ষকরাও ঠিকা শিক্ষককে, টাকা দেন। আর সরকারিভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা থাকেন উপজেলা সদরে। রাস্তাঘাটের দূরবস্থার কারণে নারী শিক্ষকদের পক্ষেও নিয়মিত স্কুলে আসা সম্ভব হয় না। কারণ ট্রলারে করে একবার বিদ্যালয়ে আসার পর তাঁরা আরেকটি ট্রলার কখন পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তাই অনেক শিক্ষকই মাঝেমধ্যে ট্রলারে এসে দু-চার ঘণ্টা স্কুলে অবস্থান করে আবার ওই ট্রলারেই ফিরে যান।

প্রতিটি স্কুলেই প্রতিদিন কোনো না কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন। তবে ফাঁকি ঢাকতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন কৌশলের। প্রত্যেক শিক্ষক স্কুলে একটি করে ছুটির আবেদন জমা রেখে যান। কর্মকর্তাদের কেউ পরিদর্শনে এলে সেটি দেখানো হয়। আর কেউ না এলে শিক্ষকরা পরে স্কুলে ফিরে হাজিরা খাতায় সই করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে আঁতাতের মাধ্যমে সব শিক্ষকই স্কুল কামাই করেন। এ জন্য প্রত্যেক

শিক্ষক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাসকাবারি টাকা দেন। ফলে শিক্ষা কর্মকর্তারা চোখ বুজে থাকেন। জামালগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা জানান, পাহাড়ি এলাকার চেয়েও দুর্গম হাওরাঞ্চল। তাই এখানে সরকারের পৃথক নীতিমালা থাকা জরুরি। বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের যাওয়া-আসা করা খুবই সমস্যা। অথচ ৬০ শতাংশই নারী শিক্ষক। এখানে নীতিমালা বদল করে পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। আর শুকনো মৌসুমে ছুটি কমিয়ে সে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। সব মিলিয়ে দুর্গম এলাকার জন্য আলাদা নীতিমালা করতে হবে।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হযরত আলী বলেন, 'আমরা হাওরাঞ্চলের প্রতিটি স্কুলের জন্যই একটি করে নৌকা চেয়েছি। আর গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাদ দিয়ে তা অন্য সময় দেওয়ার কথাও বলেছি। যেহেতু বর্ষাকালে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো আসতে পারে না, তাই গ্রীষ্মের পুরো সময়টা স্কুল খোলা রেখে কিছুটা পুষিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সব প্রস্তাবই আটকে রয়েছে। আর পুরুষ শিক্ষকের পদ খালি থাকলে নারী দিয়েও পূরণ করা যায়। কিন্তু নারী শিক্ষকের পদ খালি থাকলে তা পুরুষ শিক্ষক দিয়ে পূরণ করার উপায় নেই। আসলে এ এলাকার জন্য পুরুষ শিক্ষকের বিশেষ দরকার।' জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

দুর্গম এলাকার জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীরা সমতলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারে না। শিক্ষকরাও ঠিকমতো বিদ্যালয়ে আসতে পারছেন না। এ জন্য দুর্গম এলাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল কম্পাউন্ডেই থাকতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারকে একাধিকবার প্রস্তাবও দিয়েছি; কিন্তু তাদের খুব একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাহাড়ি এলাকায় আমরা আরো ৩০০ কুল জাতীয়করণের ব্যাপারে কাজ করছি, যাতে স্কুলগুলো বাচ্চাদের জন্য কাছাকাছি হয় এবং তারা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে। এ ছাড়া হাওরাঞ্চলের জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা হোস্টেল নির্মাণ ও নৌকা-স্কুল-এ দুই উপায়ের কল্পা ডাবছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেসব এলাকায় স্কুল নেই, সেখানে নৌকাতেই স্কুল বসতে পারে। আর যেখানে স্কুল আছে সেখানে নৌকায় করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের নিয়ে আসা হবে, আবার পৌছে দেওয়া হবে।'